ইতিহাস ও দুই-পুরুষের রং : ব্রাত্য বসুর 'অদামৃতকথা'

স্বাতী গুহ

> "Literature became the history's other in a double sense : it pretended to have discovered a dimension of reality that historians would never recognise and it developed techniques of writing that undermined the authority of history's favored realistic or plain style of writing"
> *[White 2006 - H. White, Historical Discourse and Literary Writing in Korhonen, Kuisma (ed.), Tropes for the Past : Hayden White and the History/Literature Debate, Amsterdam, Rodopi, p. 25]*

'সন ১৮৭২-এর ২৬ মার্চ। দিনটি মঙ্গলবার।'

একটি আখ্যানের সূচনা হচ্ছে এই দুটি বাক্যে। অমৃতলাল বসু-র কবিতার চার লাইন ঠিক মাথার ওপর। কিন্তু তা আলটপকা যে নয়, তাকে বছরে, মাসে, দিনে নিশ্চিত করে দিচ্ছেন লেখক।

বইটির নাম — 'অদামৃতকথা'; লেখক বাবু ব্রাত্য বসু!

মলাটের পিছন পৃষ্ঠায় ঘোষণা — 'মঞ্চের আলো আর উইংসের অন্ধকারের মাঝে যে এক ফালি আবহমান জীবন তার সুলুকসন্ধান এই উপন্যাসে। এখানে চরিত্র খুলেছে ইতিহাসের দরজা, ইতিহাস খুঁজে বের করেছে আখ্যান।...এবং ইতিহাস-উত্তর সময়ের আখ্যান।'

হেইডেন হোয়াইট ইতিহাস আর সাহিত্যের সম্পর্ক নিয়ে যে বিতর্ক চালাচ্ছিলেন, তা কি পাঠকের কিছুটা সঙ্গী হতে পারে 'অদামৃতকথা'-র আখ্যানের পরতে পরতে উঠে আসা ইতিহাস আর কল্পকথার মিশে থাকা, না-থাকা কিংবা লেখকের আরও কোন গূঢ় উদ্দেশ্যকে আবিষ্কার করতে?

'গতকালের সারা দিবসব্যাপী উন্মত্ত হোরিখেলার চিহ্ন হিসেবে, লৌহনির্মিত স্বর্ণালী রঙের সুদৃশ্য পিচকারিবাহিত, লোহিত, হরিদ্রাভ, অসিত, হরিৎ, গুলাবি ইত্যাদি বিবিধ রঙের চিহ্ন ও আবিরলাঞ্ছিত বিবিধ কুঙ্কুম, ঘাটের চবুতরার অমসৃণ, চতুষ্কোণ অংশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শুষ্ক হয়ে গেলেও, এখনও তা পর্যাপ্ত জাজ্জ্বল্যমান।' — প্রথম পৃষ্ঠাতেই লেখক যেন পাঠককে ইশারায় বলে দিলেন আগামী দু'শো চল্লিশ পৃষ্ঠা জুড়ে সেই গতকালের চিহ্ন। কিন্তু তা মোটেই বে-রং নয়। বরং তার সমস্ত রং 'এখনও পর্যাপ্ত জাজ্জ্বল্যমান'। বারাণসীর মণিকর্ণিকা ঘাটের কথায় যতই মৃত্যুর ইশারা থাকুক না কেন দুটি মানুষের চোখে রঙের পরত খুলে যাচ্ছিল একের পর এক মনোহর দৃশ্যে! বুধওয়ামঙ্গলের উৎসবের দিন সেটি। বাংলাদেশের বাইরে উত্তরপ্রদেশের হোলির পরদিনের এই বিশেষ উৎসবটির কথা বাঙালিকে যেন জানান

দিতে চান লেখক। বাবু নবীনচন্দ্র সেন আর বাবু অমৃতলাল বসু। প্রথমক্ত বাবুটি 'রৈবতক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট' — উল্লেখে একুশ-শতকী লেখকের ইতিহাসকে ব্যবহার করার বিশেষ ক্ষমতাটি লক্ষ করার মতো। যেন শুধুমাত্র বিশেষ পর্বতের বা বৃক্ষের নামমাত্র বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হল না। ডেপুটি পরবর্তী ১৮৮৭-তে উক্ত নামের একটি আখ্যানকাব্য যে রচনা করবেন, কিছুটা ভবিষ্যৎ বাণীর মত শোনালেন কি লেখক?

প্রথম অধ্যায়েই উপন্যাসের মুখ্য দুই চরিত্র অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি আর অমৃতলাল বসু-র সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন লেখক। কিন্তু এই দুজন মানুষই তো ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত। তবে কেন প্রয়োজন হল কিশোর অমৃতর এহেন বর্ণনা —

'গৌরবর্ণ, হালকা মেয়েলি তনুময়তা, কুসুমকুমারিতমাধুর্যময়, কোমলালোকিত দেহ, ভাসা ভাসা বৃহৎ চক্ষুদ্বয় থেকে রাশি রাশি স্বপ্নমালা যেন হীরকচূর্ণবৎ প্রতিফলিত হচ্ছে।' এখানেই শেষ নয়, পাঠক দেখতে পাবেন শরীরের নানা বাঁকে ও পরিধানের বিশেষত্বে উনিশশতকী বাবুয়ানি। এমনকি বাবুটির ডাকনামের সঙ্গেও পরিচয় হবে পাঠকের — '... ভুনি। ভুনি খিচুড়ির মতোই সে ঈষৎ তপ্ত, গব্য ও পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনমন্ডিত।' এভাবেই "We in a way know more about the past that the people who lived in it" *[Jenkins 2003 : 15 : Keith Jenkins, Re-Thinking History, London, Routledge.]*

লেখকের জবানিতে — 'সেই অর্ধেন্দু, যার রসবোধ অমৃতের দ্বিগুণ,...' অথচ ইতিহাস অমৃতকেই রসরাজ শিরোপা দেবে ভবিষ্যতে। 'যার অভিনয় কলাবিদ্যা অননুকরণীয়, যার সাবলীল অঙ্গসৌষ্ঠব দেখে কিশোর অমৃত মুগ্ধ হয়।' কিছুটা পরেই এই কথাগুলিকেই আরও জোরের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা গেল ঔপন্যাসিক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আলোচনার কথায় — 'অর্ধেন্দুবাবুর অভিনয়। যা দেখেছি... আমার মনে গোটা কয়েক মূর্তি সাজানো আছে। সেটা কি তাঁর প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক ভঙ্গী সূক্ষ্মতম ভাব পরিবর্তনের আদেশবাহী ছিল বলেই?' কিন্তু অমৃতর অর্ধচেতন ও নেশাসক্ত মস্তিষ্ককোটরে যে একটি মুখ বারবার জাগ্রত হয়, 'সে মুখ পূর্ণচন্দ্র নহে। তাহা অর্ধচন্দ্র।' সে 'তার ছেলেবেলার কম্বুলিয়াটোলা স্কুলের দীর্ঘাকার সহপাঠী, বাবু অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির আয়ত গম্ভীর মুখ।' লক্ষ্য করার বিষয় হল যুবক অমৃতর নববিবাহিতা বধূকে যখন চেলির পুটুলিমাত্র মনে হয় তখনও তাঁর ভুনির চেতনায় স্পন্দন তৈরি করে উত্তর কলকাতার পিরালি ব্রাহ্মণ 'অদা' ওরফে অর্ধেন্দুশেখর।

অমৃত-র হালকা মেয়েলি তনুময়তার বৈপরীত্যেই কি দীর্ঘকায় আর আয়তগম্ভীর মুখ? তবু সেই অদার সর্বাঙ্গ দিয়ে জ্যোতি ফুটে বেরোতে দেখে অমৃত! লক্ষ্যণীয় তৃতীয় অধ্যায়ের সূচনায় 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যের উৎসর্গপত্রটি। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যকে উদ্দেশ্য করে রচিত — 'সুধাময় প্রণয় তোমার, জুড়াবার স্থান এ আমার / তবে স্নিগ্ধ কলেবরে আলিঙ্গন দিলে পরে / উলে যায় হৃদয়ের ভার।' জীবনস্মৃতি-র রবীন্দ্রনাথও এক যুবকের সঙ্গে আরেক যুবকের বন্ধুতাকে অফুরান রসের উৎস হিসেবে অনুভব করেছিলেন। তাই তাঁর রচনায় বারবার দুই সখা, বন্ধু, অভিন্ন হৃদয়-প্রণয়ীর কথা ফিরে ফিরে আসে — শচীশ-শ্রীবিলাস, গোরা-বিনয়, নিখিলেশ-সন্দীপের কথা। অদা ও অমৃতর কিছুক্ষণের আলাপেও সেই হাসির ঝরনা আসে। আসে তাদের নিজস্ব অতলস্পর্শী গভীরতা! আবার এও লক্ষ্য করার বিষয়, অমৃত যতটা মথিত, আবেগতাড়িত অদা সম্পর্কে, অদা যেন ঠিক ততটা স্পষ্ট নয় অমৃত সম্পর্কে। একটি নিগূঢ় সাদৃশ্য আছে তাদের রসবোধে আর 'মনুষ্যজাতি ও জীবনকে এক ব্যাখ্যাতীত তির্যক চোখে দেখার সারূপ্যে'। অথচ অমৃত তার নামের জেরেই যেন রসে টইটুম্বুর আর অর্ধেন্দু কখনও তিক্ত, কখনও আঁশটে এবং খরশান। লেখক তাদের আঁতের কথাগুলিকেই আরও কিছুটা স্পষ্ট করতেই বলেন — 'কিন্তু

দুজনেই অন্তর থেকে বস্তুত মুগ্ধ এবং প্রসন্ন রসের অধিকারী।'

'মুগ্ধ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ ও তার কিছু প্রয়োগের দিকে দৃষ্টি দিলে পাঠক নিশ্চিত হবেন — ঋকবেদে যাকে মূঢ়, অবিবেক বলা হচ্ছে, তাকেই উত্তর রামচরিত-এ বলা হচ্ছে সরল অকপট! রঘুবংশে তাই আবার হয়ে উঠছে — রতিকলানভিজ্ঞ! সাহিত্য দর্পণ-এ তাই হয়ে ওঠে কোমল, সুরতমূঢ়, তারানাথ বাচস্পতি সংকলিত 'বাচস্পত্য' অভিধানে অর্থ নির্ধারিত হয়েছে — মোহন, সুন্দর, মনোহর, রুচির!

উত্তর চরিতে যখন বলা হল — ''মদনঃ প্রগলভব্যাপারঃ স্ফুরিত হৃদি মুগ্ধশ্চ বপুষি", তখন তা শুধুমাত্র স্ত্রী, পুরুষের পারস্পরিক মুগ্ধতায় নিঃশেষ নয়। লেখক বুঝি অত্যন্ত স্পষ্ট করে তাই প্রসন্ন রসের কথা পাড়লেন। তাই অদা ও ভুনির হৃদয়ের গঙ্গাযমুনা বা হরগৌরীর সার্থক সম্মেলনের কথা বুনতে চাইলেন ইতিহাসের শরীরে টানা কিংবা পোড়েনের মতো।

এর ফলে লেখক বাবু ব্রাত্য বসু যেন প্রমাণ করছেন ইতিহাস এক ধরনের "personal construct, a manifestation of historian's perspective as a narrator" মাত্র! জেনকিন্সের তথ্য যেন প্রমাণিত হচ্ছে এ আখ্যানের পদে পদে। একুশ-শতকীয় লেখক যখন উনিশ শতকের শেষ ভাগকে বর্ণনা করছেন তখন তা শুধু যেন বর্ণিত চরিত্রগুলিকে ফিরে দেখা মাত্র নয়। তার একটি নবতম ব্যাখ্যাও তৈরি হয়ে উঠছে। 'যুবা অর্ধেন্দুকে দেখে শিক্ষাবিদতনয় কিশোর অমৃত তার জীবনের ওই ফুসলানিটি পেল, যা অতঃপর তাকে হিন্দু কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ এবং সেনেট-সিন্ডিকেট অধ্যুষিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কুসুমকণ্টকিত জীবনে থিতু হতে দিল না।' জেনকিন্সের মতে "history in the way people(s) create, in part, their identities" তাই আমরা অলিভিয়া চিরোবসিয়া-র সঙ্গে একমত হয়ে বলতে পারি — "...and each generation re-writes history." বাবু ব্রাত্য বসুর জীবনের সেই ফুসলানিটি নিয়ে হয়ত কাজ করবেন আগামী গবেষক। যা তাঁকেও থিতু হতে দেয়নি ভুনির মতই কোনও একটিমাত্র পরিচয়ে। কবি, লেখক, নাটককার, থিয়েটার অভিনেতা, থিয়েটার-ওয়ালা, সিনেমা-পরিচালক, ঔপন্যাসিক, সংগঠক, সমাজসেবী — নানা পরিচয়ে তাঁর গতায়াত। ইতিহাসের গবেষণা করতে করতেই কি তাই তাঁকেও রচনা করতে হয় আর এক ইতিহাসের বৃত্ত। যা অতীত থেকে বর্তমানে যাতায়াত করে প্রতিনিয়ত।

১৮৭২-এ ভুনি আর অদার যে মানসিক সম্পর্কের শুরুয়াত, সে সময়ের বেশ কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে এ আখ্যানে। সে বছরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কলকাতার ন্যাশনাল থিয়েটার। জাতীয়তাবাদী বাতাবরণ ক্রমশ স্বদেশভাবনাকে গড়ে তুলছিল মূর্তি গঠনের মতোই। নবগোপাল মিত্রর 'হিন্দুমেলা', সর্বত্র ন্যাশনাল খুঁজে ফেরা, সে সময়ের সেই ইতিহাস কি তবে আজও পুনর্বার লিখিত হচ্ছে? ১৮৭২-এই লাগু হয়েছিল নতুন পৌর আইন; ইণ্ডিয়ান কন্ট্রাক্ট আইন, ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চিয়ান ম্যারেজ অ্যাক্ট; দ্য ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রকাশও ১৮৭২-এই। অরবিন্দর জন্ম এ বছরের ১৫ আগস্ট। ভাইসরয় লর্ড মায়োর উদ্যোগে ১৮৭২-এ শুরু হয় জনগণনা; যদিও তা সম্পূর্ণ হয়নি। আর এক বছর পর কলকাতায় প্রথম চলেছিল ঘোড়ায় টানা ট্রাম। এই উপন্যাসের আখ্যান মূলতঃ বাংলা থিয়েটারের জগতের কলাকুশলী ও তাকে ঘিরে গড়ে ওঠা সংস্কৃতির অন্দর-বাহিরের জায়মানতাকে ধরতে চেয়েছে। ইতিহাসবেত্তা লেখক প্রায় ঘোষণার মতো করে উল্লেখ করেন — পৌর সংস্কারের হাত ধরেই যেন 'বাংলা থিয়েটার...বাঙালি মধ্যবিত্তের হাতে চলে গেল, শুরু হল বাংলা থিয়েটারের আরেক নতুন উড়ান'। কিন্তু ইতিহাস তো পালা বদলে বদলে চলে। তাই বিশ শতকের শেষ পর্বে এসে পেশাদারী থিয়েটার নিয়ে নতুন করে ভাবতে হল তাঁকেই, যিনি এই উপন্যাস

লিখবেন বলে হয়ত প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন থেকেই! কিন্তু এ কাজ কারও একার ছিল না। এখনও হয়ত নেই। তাই বারবার কোম্পানি থিয়েটারের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দিয়েও মাঝেমাঝে ব্যাটনটা তাঁকে তুলে দিতে হয়েছে অন্য কারও হাতে। অমৃতলালের মতো তাঁকেও ডুবে যেতে হয়েছে লেখার কাজে। সৃষ্টির নানা ঘাঁতঘোঁত তাঁর অনায়াসসাধ্য। তাই এক একটা ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে আজও।

তাই ১৮৭৬-এর নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন একটি ঐতিহাসিক সত্যের চেয়ে যেন একটা সময় বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এ উপন্যাসের মুখ্য চরিত্রের কাছে। মূলতঃ অমৃতলালের কাছে। এইচ বিভার্লি কলকাতা পৌর এলাকার আদমশুমারির রিপোর্ট জমা দেন এ সময়। ১৮৭২-এর ৭ ডিসেম্বর কলকাতার বাঙালি প্রথম টিকিট বিক্রি করে থিয়েটার করেছে। বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার থেকে শ্যামবাজার নাট্য সমাজ হয়ে দলের নাম হয়েছে 'ন্যাশনাল থিয়েটার'। গিরিশ ঘোষের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও ন্যাশনাল নামটি টিকে যায়। সেখানে অমৃতলাল ফিরে আসেন বারাণসী, বর্ধমান ঘুরে। খেয়াল করার মতো ব্যাপার হল 'নীলদর্পণ' নাটকে 'সৈরিন্ধ্রী'-র ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য অমৃতকে ডেকে নেন স্বয়ং অর্ধেন্দু — 'অতঃপর অমৃতর ঐ শীর্ণ, সুললিত কাঁধে হাত রেখে অর্ধেন্দু বললে, অভিনেতাদের পার্ট পড়ানোর দায়িত্বটাও অমৃতকে অর্ধেন্দুর সঙ্গে ভাগ করে নিতে হবে।' (পৃ: ৬৭) এইসব চাওয়াগুলি কি অমৃত আর অদার ব্যক্তি জীবনের গূঢ় কোনও সম্পর্কের দ্যোতনা? এ প্রশ্নটি সমস্ত উপন্যাস জুড়ে যেন জিইয়ে রেখেছেন লেখক। কিংবা সামান্য ইশারা দিতে চেয়ে ঢুকে পড়েছেন আর কিছুটা ভিতরে। তাই ১৮৭৬-এর ৪ মার্চ 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকের স্টেজ ম্যানেজার অমৃতলাল বসু গ্রেফতার হলেন। ২০ মার্চ ছাড়া পেলেও মন একেবারে ভেঙে গেল তাঁর। ১৮৭৭-এ পুলিশের চাকরি নিয়ে আন্দামানে পাড়ি দিলেন অমৃত। জেলের স্মৃতিকে মুছে ফেলতেই যেন এই কালাপানি যাত্রা! অর্ধেন্দু একবারও জেলবন্দি অমৃতকে দেখতে যাননি, সেই প্রত্যাখ্যান যেন কিছুতেই ছেড়ে যেতে চায় না ভুনিকে। তবু সেই অতীতকে যেন ভুলতে পারে না সে। দল গড়া আর ভাঙার ইতিহাসে তারা দুজন যেমন করে জুড়ে ছিল, সে কথা কিছুতেই ভুলতে পারেনি অমৃতলাল। অদাও কি পেরেছিল? হয়ত না।

আশ্চর্য ব্যাপার, তৃতীয় অধ্যায়ে যখন অর্ধেন্দু অমৃতকে থিয়েটার দেখতে যাওয়ার অনুরোধ করে তখন ভুনি রাজি হয় না সেই প্রস্তাবে। অথচ তাকে বর্ণনা করা হয়েছে মনের রুদ্ধ বাসনা কোনও রকমে সংবৃত করে রাখার সঙ্গে। যেন উমা-পার্বতীর সামনে তুলে ধরা হল শিবের প্রণয় প্রস্তাব। তাই উমা যেমন কোনও উত্তর না দিয়ে শুধু নখ দিয়ে মৃত্তিকা খনন করেন আর হাতের লীলাকমলের পাপড়ি গুনতে থাকেন, তেমনই যেন অমৃত অর্ধেন্দুর আহবানে সাড়া দিতে গিয়ে বিহ্বলভাব! লেখক অমৃতর মনের অবস্থাকে আরও কিছুটা নিশ্চিত করে দিতে উল্লেখ করেন — 'কিন্তু অর্ধেন্দু চলে যাওয়ার পর সেইদিন, অনেকক্ষণ নিজের পড়ার ঘরে চুপ করে বসে রইল অমৃত। মাতা ভুবনমোহিনী ও স্ত্রী কালীকুমারীর উপর্যুপরি অনুরোধ সত্ত্বেও সে রাতে দাঁতে কুটোটিও দিল না অমৃত।' ঠিক এমনই ঘটল আবার পঞ্চম অধ্যায়ে, আন্দামান যাওয়ার জাহাজে। 'বাইরে রাতের সমুদ্র শান্ত। জাহাজ আস্তে আস্তে কালো জল কেটে চলেছে।' হিন্দু যাত্রী বলে সাহেব কোম্পানির জাহাজে নিরামিষ খাবার দিয়ে যেত বেয়ারা। এসব খাবার তার পছন্দ ছিল না। তার মন যখন সেই পরিবেশে বিরক্ত হয়ে উঠত তখনই তার মানসপটে ভেসে উঠত সপ্রতিভ, সতেজ অর্ধেন্দু-মুখ! একলা কেবিনে সেসময় যেন অভিমানও তার গলে যেতে শুরু করেছিল। অথচ 'শহরের প্রতি বীতশ্রদ্ধায়, থিয়েটারের প্রতি বিতৃষ্ণায়, চিরসখা অর্ধেন্দুশেখরের প্রতি এক আসক্তিময় অভিমানে, রাতের খাবার এক দানা মুখেও দিলে না সে।' লক্ষ্য করার বিষয় হল, সে সময় বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' পড়ার ইচ্ছে হল তার। কিন্তু ঘুম জড়িয়ে ধরেছিল

তাকে। সময়ের সমস্ত দলাদলি আর আন্দোলনের চাপ থেকে রেহাই পেতে যেমন সে আন্দামানের পথ ধরেছিল, তেমনি মনের ভিতরে সমস্ত আন্দোলন থেকে বাঁচতেই যেন ঘুমের কাছে আত্মসমর্পণ তার। লেখক আবারও অমৃতর মনের ভিতরের ছবিকে স্পষ্ট করে তুলবেন বলে রচনা করলেন অমোঘ কয়েকটি শব্দমালা — 'যার প্রতি সে অভিমানে, ভালবাসায়, রাগে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, সেই অর্ধেন্দু...'

মনে রাখতে হবে ১৮৬১তেই ব্রিটিশ সরকার সমকামিতাকে একেবারে আইনবিরুদ্ধ বলে ফতোয়া দিয়েছে। পাস হয়েছে সেকশন ৩৭৭! স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের বাইরে যাবতীয় যৌন সম্পর্ককে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এই আইনের বলে। অবশ্য এর থেকে প্রমাণ মেলে ভারতীয় সমাজে হেটোরোনরমাটিভিটি একমাত্র সত্য ছিল না। বরং যৌনতা নিয়ে অনেক বেশি ফ্লুইড বা সহজগম্য ছিল আমাদের সমাজ। তাই অর্ধেন্দুশেখর বা অমৃতলালের পরস্পরের প্রতি যে ভালবাসা তাকে লেখক যেন কিছুটা হলেও গুরুত্ব দিতে চাইলেন বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে। এই দুটি পুরুষই অল্পবয়সে বিবাহিত। সেসময়ের নিয়মমাফিক। কিন্তু শাকম্ভরী কি অর্ধেন্দু বা অদার সহধর্মিণী হয়ে উঠতে পেরেছিলেন? কালীকুমারী অমৃতর ছয় সন্তানের মা। কিন্তু গৃহিণী-সচিব-সখী কি হতে পেরেছিলেন তাঁরা এই দুই শিল্পী মানুষের? তাই নিজের লেখা কবিতা নিয়ে অমৃত নিজেকেই যেন ছিঁড়ে-খুঁড়ে দেখতে চান —

'বিবাহতে পুরুষের হয় সংঘটন। / স্বাধীনতার স্বর্গ হতে প্রথম পতন।।' (পতি - কবিতা : অমৃত-মদিরা কাব্য) নিজের ভিতরে টের পান সমস্ত মহিলাদের ওপর তাঁর জমে থাকা রাগ। কিন্তু কেন? পাঠক যেন এতটা পথ পেরিয়ে এসে নতুন এক দিশা খুঁজে পাবেন হাতেনাতে। উপন্যাসের একেবারে শেষে এসে আয়নায় ভুনিকে দেখতে থাকেন রসরাজ! যেন ইগো আর অলটার-ইগো মুখোমুখি। যেন নিজেকে বা চরিত্রকে ফালাফালা করে চিরে দেখাতে চান লেখক। তাই — 'কাঁদতে কাঁদতেই নিজের সালংকারা অপর সত্তা ভুনিকে বললেন, 'তুই ঠিক বলেছিস ভুনি। আমার ভেতর চিরকাল একজন মহিলা বাস করেছেন'।' (পৃষ্ঠা - ২৩৮) এই শরীর আর মনে আলাদা দুটি সত্তার পরস্পরকে নিয়ে বোঝাপড়া তো সহজে মিটবার নয়। আজকের ভাষায় যাকে ট্রান্স বলে হয়ত কিছুটা বোঝানো যেতেও পারে। জৈবিক শরীরে পুরুষ চিহ্ন বহন করেও মনের গহনে যে নারী সত্তাকে লালন করেছে অমৃত তা তাকে সহজ হতে দেয়নি সারাটা জীবন। কারণ কম বয়সে তার ভেতরের মহিলাটি ছিল শান্ত তার বাইরের পুরুষভাব ছিল খ্যাপাটে। সেই কম্বুলিয়াটোলা স্কুলের বালক থেকে শুরু করে বুড়ুয়ামঙ্গলের দিনের প্রভাতকালীন বারাণসী তীরের কিশোর কিংবা যুবক হয়ে ওঠার পথে পা-বাড়ানো ছেলেটি সত্যিই ছিল খ্যাপাটে। হতে চেয়েছিল ডাক্তার। হয়ে উঠেছিল অভিনেতা, লেখক, সংগঠক। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি হয়েছিল শান্ত। আর মেয়েটি দুরন্ত। এই মেয়েটিই কি আকণ্ঠ ভালবেসে ফেলেছিল অর্ধেন্দু তথা অদাকে? হয়ত সেই টানেই থিয়েটারে আসা ভুনির! সেই টান কখনও শিথিল হয়নি ভিতরে। বাইরে যতই বিরুদ্ধে যাওয়া থাক না কেন! ভুনি নিজের কাছে নিজের কৈফিয়ত নিয়ে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায় যখন, তখন টের পায় — 'সেই আধা জটিলতায়, আধা কামনায়, আধা হতাশায় আমি নিজের ভিতরে পুড়ি। সেই পোড়ার ফোসকা আমার লেখায় বেরোয়। আমার শিল্পে।' ভয়ংকর নির্মম সত্যকে যেন স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া আর কোনও রাস্তা খোলা থাকে না। তার ভিতরের ওই মহিলাটিকে ভুনি ভয় পায়। মনের গোপন চোরা অন্ধকারের গল্প যেন উঠে আসে ভাষ্যে — 'তাকে তখন আমার নিজের স্ত্রী বলে মনে হয়।' একে কি তবে বুঝতে হবে আধুনিক মনোবিকলনের তত্ত্ব দিয়ে?

আসলে ভুনি যেন অদারই অর্ধেক আকাশ! তাই সে ছেলেবেলার প্রতিভাবান বন্ধু অদাকেই খোঁজে।

শৈশবের বিকেলগুলোর নরম রোদ্দুরে হাত সেঁকে নিতে চায় সে। উপন্যাসের শুরুর মতোই শেষে 'সেই কাশির গঙ্গার ঘাট, ব্রিজের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে ঝিকমিক করে চলে যাওয়া মালগাড়িগুলোকে, আর সেই সুন্দর সব সূর্য ওঠা আর সূর্যাস্তগুলোকে' খুঁজে ফেরে সে। সন্ধ্যের মুখে বাড়ি ফিরতে চাওয়া পাখিদের উড়তে থাকার ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে থাকতে আর অতীতের নাট্যশালার উজ্জ্বল দিনগুলো, রাতগুলোকে ফিরে পেতে চায় সে। মনের ভিতরে পরতে পরতে আলো ফেলতে ফেলতে এগোতে থাকা একুশ-শতকী লেখক যেন আচমকা টের পান, কোথাও একটা বড্ড বেশি গভীরে ডুবে যাচ্ছেন হয়ত তিনিও। চরিত্রের পরতে পরতে উন্মুক্ত হতে হতে মনে হয় এবার সময় হয়েছে বিপ্রতীপে চলার। তাই শিশুর দেয়ালার প্রসঙ্গ তুলে আনেন। যেন আবার সেই পয়েন্ট অফ শিফটিং-এর কথাই মনে পড়ে তাঁর। কিন্তু এখানে সময়ের বদল নতুন চরিত্র হয়ে ওঠে। থিয়েটার থেকে সিনেমা, ক্যামেরা-ট্রলি, ট্রাম-লাইন উত্তর থেকে দক্ষিণমুখো চলতে শুরু করে। সমস্ত থিয়েটারি দৃশ্যপটকে সিনেমাটিক প্যানে ধরতে চান লেখক। তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা যেন তাঁকে ভিতর থেকে সায় দেয়। কলম থেকে শব্দগুলিকে মুক্তি দিতে দিতে কোথাও একটা রোখ চেপে বসে। অ্যাঙ্গেল বদলে দেখাটা বদলানোর খেলা পেয়ে বসে লেখককে। মনে রাখতে হবে ঔপন্যাসিক ব্রাত্য বসু থিয়েটারের স্পেসটা ব্যবহার করতে করতেই চোখ রাখেন সিনেমার বিভিন্ন কৌণিক তলে। কিংবা কখনও কখনও হয়ত ভাবেন, এই মাধ্যমটাই তাঁর জন্য উপযুক্ত। যতটা জীবন, যতটা আকাশ, যতটা আলো আর অন্ধকার দেখাতে চান তাঁর শিল্পে তা হয়ত সিনেমায় সম্ভব কিছুটা বেশি।

মনে রাখতে হবে, অমৃতর সমস্যা হত অর্ধেন্দুর কোনও কোনও শিষ্যাকে নিয়ে। কোনও অভিনেত্রীর সঙ্গে অর্ধেন্দুর ঘনিষ্ঠতা হলেই তাকে আর পছন্দ হত না অমৃতর। যদিও এসব কিছুকে অমৃতর রোমান্টিক খেয়াল বলে কিছুটা হালকা হাওয়া বুনে দিতে চেয়েছেন লেখক। গোলাপসুন্দরী, হরিমতি কাউকেই সেভাবে ভাল লাগত না তার। কিন্তু অর্ধেন্দু বা অদাও চিঠিতে লিখছেন ভুনিকে — 'আমাদের ছেলেবেলা থেকে এইসব অকারণ দৌড় যে প্রথমে পূরবী, পরে ইমনকল্যাণের আলাপের মতো।' আর অমৃত বিশ্বাস করত 'অর্ধেন্দু হচ্ছে ন্যাশনাল প্রপার্টি'। সে শুধু তার সহপাঠীমাত্র নয়, সে তার নাট্যগুরুও। অর্ধেন্দুকে কেউ ভালবাসলে অমৃতর আনন্দ হয়! কিন্তু মনে রাখতে হবে সে আনন্দের সীমা আসলে অনেকটা বাইরের ব্যাপার। সামাজিক ক্ষেত্রের কথা। অর্ধেন্দু যে ভুনি সম্পর্কে আশ্চর্য এক আলোর কথা ভেবে গেছে সারাজীবন তা তো আর গোপন থাকেনি। সেই চিঠি, যেটি হারিয়ে গিয়েছিল, তাতে তো লেখা ছিল — 'এলে ভুনি। তুমি এলে। আমার চিরসখাকে আমি আমার থিয়েটারে পেলাম। যেন আলো জ্বলে উঠল চারিদিকে। তুমি এর পর সব জানো ভুনি।' — এ বয়ান লেখক কি তুলে আনেন মনের সেই গভীরতর তল থেকে? যেখানে 'থিয়েটার মিশনারি' অদা বারবার পালাতে চাইতেন। অথচ ধরা পড়ে যেতেন। ফিরতেই হত তাঁকে। তাই স্বীকার করেই ছাড়েন — 'তোমার চোখেও আমার জন্য বিদ্যুন্মালা ছিল, ...' কিন্তু তাকে গ্রহণে কি সক্ষম ছিলেন না অদা? তাই একলা ঘরে বসে শব্দমালা গাঁথতে গাঁথতে কেমন যেন নিঃস্ব লাগে তাঁর নিজেকে। নিজের সেই খামতিটুকুকে প্রকাশ করে লেখেন — 'কিন্তু আমি তো তা দেখেছি ভক্তের পূজা হিসেবে। অনুরাগীর মালা হিসেবে নয়।' কারণ কি তবে সেই সামাজিক মানুষের চিরন্তন অপারগতাই? হয়ত! হয়ত তাই। তাই নিজেকে নিংড়ে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি চিঠিতে সেই না বলা কথাগুলি খোদাই করে রেখে দিতে চান কালের হাতে — '... আমার নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা, আমার কাতরতার সঙ্গে আমি কীভাবে বোঝাপড়া করেছি, তা শুধু আমিই জানি।' (পৃষ্ঠা : ১৭২) লেখকও কি তবে সেই হারিয়ে ফেলা, পুড়িয়ে ফেলা চিঠির আখরে নিজের সময়ের ক্ষতকে পুরে দিতে চান, কোনও এক মুক্তির আশায়!

হ্যাঁ, মুক্তিই! কারণ অদা জানত তার আর ভুনির সম্পর্কটা ঠিক কেমন! লেখক কি এই মুহূর্তের কথাগুলিকে সাজাতে সাজাতে কোনও একটা সমাধান সূত্রকে খুঁজে বার করতে চাইছিলেন? নিজের ভেতরের প্রশ্নমালার উত্তরে তাই তিনি অর্ধেন্দুর বয়ানে জুড়ে দেন 'নিশ্চিত' শব্দটি — 'আমি নিশ্চিত জানি, তোমার-আমার সম্পর্কের মধ্যে মহাকালের কাছে কোনো জমা খরচ বাকি নেই। তুমিও জানো আর আমিও জানি, আমাদের মধ্যে যা যা কিছু ঘটেছে, তা একান্তভাবেই দু'জনের পারস্পরিক ভালবাসা আর বাঘনখের শোধবোধে একাকার হয়ে গেছে।' (পৃষ্ঠা : ১৭৮) আর একেবারে শেষ অধ্যায়ে শেষের দিক থেকে তিন নম্বর লাইনে লেখকের প্রিয় কবির কথা এসে পড়ে। ইতিহাসের সমস্ত দূরত্বকে ম্লান করে দিয়ে উচ্চারিত হয় — 'আকাশের ওপারেও কি আকাশ থাকে?' এটা যেন কোনও প্রশ্ন নয়। প্রশ্নচিহ্ন ব্যবহার করে নিজের ভিতরের বিশ্বাসটাকেই চারিয়ে দেওয়া। যেন অর্ধেন্দুর মতো। যেন অমৃতর মতো। কিংবা তা অদামৃত মাত্র! চরিত্ররা তখন আকাশে ডানা মেলে দিয়েছে। তাই লেখকের চোখে ক্যামেরায় সেই অনন্ত আকাশের বিভা। তখন সাহিত্য না ইতিহাস, নাকি এ-দুই ভাষ্য হয়ে উঠছে চিরন্তন জীবনের! যাকে কালে-স্থানে বাঁধা চলে না। আডাম স্কাফ-এর ইতিহাস আর সত্যের বোঝাপড়াকে সামনে রেখে বলা চলে — "objectivity would be simply a fiction, since would assume that man is a superhuman being..." (page 233).

'অদামৃতকথা'-কে পাঠক একালের অমৃত-কথন হিসেবে যতটা দেখতে চাইবেন, ঠিক ততটাই আস্বাদ করতে সমর্থ হবেন। আর যদি ফিরে যেতে চান বাংলা থিয়েটারের দিক ও পালাবদলের ইতিহাসলগ্নতা হাড়ে-মাসে-মজ্জায় চেখে দেখতে, তাও সম্ভব। লেখক কোন কসুর রাখেননি। না কাহিনি-বয়নে, না চরিত্র-চিত্রণে। উত্তর কলকাতার অলি-গলি-গঙ্গার ঘাটে লেপটে থাকা জীবন যেন নিশুত রাতের একাকী ট্রাম লাইনে পা রেখে গল্প করতে করতে হেঁটে চলে। গিরিশ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, ঠাকুরবাড়ির শরিকেরা, বিদ্যাসাগর মশাই, রামকৃষ্ণদেব, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল, নবীনচন্দ্র, দানীবাবু, অমর দত্তরা এই কথকতায় আছেন। কিন্তু অদা আর ভুনিই যেন এ কথার প্রাণকেন্দ্র।

ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক কিংবা সাহিত্যের শরীরে ইতিহাসকে গেঁথে দেওয়ার প্রক্রিয়াটি ঔপন্যাসিক ব্রাত্য বসু আত্মস্থ করেছেন বারবার। এক্ষেত্রেও তিনি পারঙ্গম। দুজন মানুষের অন্তরের সম্পর্ককে ঝালিয়ে বাজিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছেন তিনি কালের মন্দিরায়। তাই মার্ক ওয়ালাকট্-এর ইতিহাস আর সাহিত্যের সম্পর্ক নিয়ে তত্ত্বকথাটি দিয়ে আপাতত 'অদামৃতকথা'-র সত্যি মানুষ আর সত্যি ঘটনার গড়নের বিশেষত্বকে যাচাই করতে ইচ্ছে হয়। বিশ্বাস করতে ভাল লাগে এ কথা বা কথকতাকে কুর্ণিশ করবেন পাঠক। আর ভবিষ্যৎ গবেষক খুঁজে ফিরবেন সেই পরশপাথর — কারণ

> "Historical fiction is a popular form of literature. It shows the deep connections between history and literature by having the writer study a particular era from the past in order to write a story. These stories may be wholly fictional or they might be fictionalised accounts of real people and real events." *[What is the connection between literature and history? Mark Wollacott]*

সূত্র :

ব্রাত্য বসু : অদামৃতকথা [আনন্দ পাবলিশার্স, ২০২২]

White 2006 - H. White, Historical Discourse and Literary Writing in Korhonen, Kuisma (ed.), - Tropes for the Past - Hayden White and the History/Literature Debate, Amsterdam, Rodopi, p. 25-33.

Jenkins 2003 - Keirh Jenkins, Re-Thinking History, London, Routledge.

Schaff 1976 - Adam Schaff, History and Truth, New York and Oxford, Pergamon Press.

Mark Wollacott - What is the Connection between Literature and History?

Olivia Chirobocea - Tudor - Perspectives on the Relation between History and Fiction.

স্বাতী গুহ : গল্পকার ও প্রাবন্ধিক। বর্তমানে ইন্‌স্টিটিউট অফ্ ল্যাংগুয়েজ ষ্টাডিস এণ্ড রিসার্চ-এর ডিরেক্টর।